ভারতবর্ষ ও ইসলাম : পাঠ, মুগ্ধতা এবং

শ্রীপর্ণা দত্ত

ভারতবর্ষ ও ইসলাম
সুরজিৎ দাশগুপ্ত
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১১
প্রচ্ছদ : পরিতোষ সেন
ডি এম লাইব্রেরি ৪২ বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০০০৬
২০০ টাকা

দেশ কে গদ্দারো কো... মারো শালো কো... দেশের মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর এমন স্লোগান জনপ্রিয়তায় ও বিভীষিকায় অনেক স্লোগানকেই হারিয়ে দিতে পারে। বিভীষিকার মাত্রাটি ঠিক কেমন, জানে পুড়ে যাওয়া দিল্লি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে আইন বাঁচিয়ে সংঘর্ষ বলা দস্তুর হলেও, সংগঠিত সুচিন্তিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যে ছবি দেশবাসী দেখেছে তাতে মাননীয় মন্ত্রীমশাই-এর স্লোগানের মাহাত্ম্য হাড়ে হাড়ে অনুভূত হয়। বন্দেমাতরম—ইন কিলাব জিন্দাবাদ—জয় জওয়ান জয় কিষান—থেকে মনুবাদ সে আজাদি, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র একেক সময় এক এক স্লোগানের উন্মাদনা দেখেছে। কিন্তু বিজেপি শাসিত ভারতে সাভারকর গোলওয়ালেকরের আদর্শে যে নয়া হিন্দুত্বের ধারণা প্রচার করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ; তাতে আর যাই থাক হিন্দু ধর্মের উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতার সুপ্রাচীন আদর্শটি আহত হচ্ছে। নরেন মোদি ও নরেন দত্ত যে, কোনোভাবেই একই হিন্দুত্বের প্রচারক নন তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বজরং দল ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন একই আদর্শে পরিচালিত হয় না। প্রশ্ন হল দেশের সংখ্যালঘু সহনাগরিক কেন গদ্দার বলে চিহ্নিত হবেন? গদ্দার শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিশ্বাসঘাতকতা। ভারতের ইতিহাসে শাসনকাল বাদ দিয়ে সোজা এক লাফে যদি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসও দেখি, দেখব শহিদ তালিকায় মুসলমান দেশপ্রেমিকের নাম হিন্দু দেশ প্রেমিকের থেকে সংখ্যায় খুব পিছিয়ে নেই। স্বাধীনতার সময় দেশভাগের যে ডানা ভাঙা যন্ত্রণা ছিল সে সময়ও ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানের নাগরিক হতে চায়নি। সীমান্ত গান্ধী বার বার বলেছেন ভাই

হয়ে ভাইকে হায়নার মুখে ঠেলে দেব? ভারতের মাটি এই মুসলমানের স্বদেশ, নমাজের সময় সে চুম্বন করে এ-দেশের মাটি, মৃত্যুর পর তার অস্থি মজ্জা মিশে যায় এ-দেশের মাটিতে। সুতরাং কাকে গদ্দার বলে চিহ্নিত করব মন্ত্রীমশাই? হিন্দুস্থান বলে যাকে জানি সে কি কেবল হিন্দুর বাসভূমি? বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বহু পথ ও মতের যে স্রোত বহমান, যাকে সেকুলার ভারত বলে চিনি এত সহজ হবে তার ভিত্তিটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া? প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে হাতে এল সুরজিৎ দাশগুপ্তের *ভারতবর্ষ ও ইসলাম* বইটি। আঠারো পরিচ্ছেদে, সুপরিকল্পিত অধ্যায় বিন্যাসে সাজানো, প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি।

বইটির প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক আলোকপাত করেছেন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বিষয়ে। সেখানে আমরা একটা প্রশ্নের মীমাংসা পাব হিন্দুস্থান বলে যাকে জানি সে কি কেবল হিন্দু ধর্মের মানুষের দেশ?

> কেউ কেউ ভারতবর্ষকে হিন্দুস্তান বলে উল্লেখ করে থাকে। সংক্ষেপে এই উপমহাদেশকে হিন্দ্ বলাও হয়েছে এবং ভারতবর্ষের জয় অর্থেই প্রথম জয় হিন্দ্ ধ্বনির উৎপত্তি। মাত্র বিংশ শতাব্দীতেই ফারসী ভাষায় হিন্দুস্তান শব্দটা রূপান্তরিত হয় হিন্দী ভাষার হিন্দুস্থান শব্দটিতে এবং কারও কারও কাছে হিন্দুস্থান শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্থান বা দেশ হিসাবে। অথচ হিন্দ্ বা হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান শব্দগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। ...হিন্দুস্তান বা হিন্দু শব্দটির মূলে আছে সিন্ধু নদ। 'স'-এর উচ্চারণ প্রাচীন পারস্যবাসীদের জিহ্বায় 'হ' হয়ে যায় যেমন 'প'-এর উচ্চারণ আরবদের জিহ্বায় হয় 'ফ' এবং তার থেকেই পারসী শব্দটা রূপান্তরিত হয় ফারসীতে। ... এভাবেই সিন্ধু নদের তীরবর্তী অধিবাসীরা অভিহিত হয় হিন্দু বলে। ইতিহাসের পরিহাসে আজকের যুগে ভৌগোলিক অর্থে যারা হিন্দু, রাজনৈতিক অর্থে তারা পাকিস্তানী নামে পরিচিত। সিন্ধুর উচ্চারণ যেমন পারসীদের জিহ্বাতে হিন্দু হয় তেমনই গ্রীকদের জিহ্বাতে হয় ইন্দু এবং ইন্দু থেকেই ইণ্ডিয়া শব্দটির উৎপত্তি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 'দি হিন্দু ভিউ অফ লাইফ' বক্তৃতামালায় গোড়ার দিকেই স্পষ্ট করে বলে নিয়েছেন, 'The term "Hindu" had originally a territorial and not a credal significance. It implied residence in a well-defined geographical area.' তাহলে সংকীর্ণ অর্থে হিন্দুস্তান মানে শুধু উত্তর ভারতকে বোঝালেও প্রকৃতপক্ষে শব্দটির আধারে সমগ্র ভারতবর্ষ বিধৃত। রাধাকৃষ্ণনের বিশ্লেষণ অনুসারে এই হিন্দুস্তানে প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার মানুষ থেকে শুরু করে সুসংস্কৃত দ্রাবিড়, বৈদিক আর্য এবং আরও অনেক ভাষাভাষীর বাস।
>
> (*ভারতবর্ষ ও ইসলাম* : পৃষ্ঠা ৩-৪)

এখন প্রশ্ন হল তাহলে হিন্দু বলতে ঠিক কী বুঝব? একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠী না কি কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী? প্রসঙ্গত উল্লেখ করব অন্য একটি বইয়ের। ক্ষিতিমোহন সেনের *হিন্দু ধর্ম*। সেখানে তিনি হিন্দু ধর্মের কথা বলতে গিয়ে বহুমত ও পথের কথা বলেছেন।

খ্রিস্টান, ইসলাম বা বৌদ্ধ— বিশ্বের এইসব ধর্মের যেমন একজন প্রবর্তক আছেন হিন্দু ধর্মের তেমন কোনো প্রবর্তক নেই। প্রায় পাঁচহাজার বছর ধরে ভারতের সমস্ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সাঙ্গীকরণ ও স্বীকরণের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ গড়ে উঠেছে এই ধর্ম। ফলত মতান্তরের মীমাংসার জন্য এর কোনো বাইবেল, কোরাণ কিংবা ধম্মপদ নেই। বেদ উপনিষদ গীতা, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, তথাকথিত ষড়দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাবলী, ভক্তি ধর্মান্দোলনের পদাবলী সাহিত্য, মরমীয়া সাধকের গান— এসমস্তই প্রামাণ্য আকর, কিন্তু কোনোটিই এককভাবে নয়।

(*হিন্দু ধর্ম* : ক্ষিতিমোহন সেন)

ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে যেকোনো আলোচনায় আর্য শব্দটি আসবেই। সিন্ধুনদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর আদিমতম নাগরিক সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার বছরের মাঝামাঝি এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় তথাকথিত আর্য আক্রমণের ফলে। সেক্ষেত্রে কেবল ধর্মপরিচয়ে ঋকবেদের অনুসারী আর্য তা নয়, বরং আর্য বলতে বুঝব আক্রমণকারীকে। যারা বাইরে থেকে এসে ধ্বংস করেছিল উন্নত অনার্য সভ্যতাকে। জীবনযাত্রা সংস্কৃতি যা কিছু ছিল অনার্য সভ্যতা সেসব সম্বন্ধে আর্যদের ছিল প্রবল অবহেলা। শুধু দৈহিক সংগঠন নয় আর্য উন্নাসিকতায় তারা অনার্যদের যা কিছু সমৃদ্ধি ছিল তাকে নিচু মানদণ্ডে বিচার করত। রাক্ষস সাপ পাখি অসুর এসব উপমায় তুলনা করা হত অনার্যদের। সুরজিৎ দাশগুপ্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আর্যদের এই অনার্য বিজয়ের নেপথ্যে ছিল ঘোড়া ও লোহার ব্যবহার।

ভারতবর্ষ অভিযানে বৈদিক আর্যদের প্রধান সহায় ছিল ঘোড়া আর লোহা। ... অনার্যরা হাতি ধরতে আর পোষ মানাতে জানত। কিন্তু যুদ্ধের সময় হাতির চাইতে ঘোড়ার গতি ও ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি কার্যকর। ... অনার্যরা তামার ব্যবহার জানত, কিন্তু লোহার ব্যবহার জানত না। ঘোড়া ও লোহা বৈদিক আর্যদের সামরিক সাফল্যের একটা খুব বড় কারণ।

(*ভারতবর্ষ ও ইসলাম* : পৃষ্ঠা ৯)

একই ভাবে তুর্কি আক্রমণের নেপথ্যেও ঘোড়ার পিঠে পাদানির ব্যবহার তাদের অস্ত্রচালনায় ক্ষিপ্রতার সংযোগ করেছিল। আবার বাবর জানতেন বারুদের ব্যবহার। ইংরেজ বণিকরা সিরাজের থেকে উন্নত অস্ত্রের ব্যবহার জানত। আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম উন্নত মারণাস্ত্র নির্মাণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আর্যধর্মের পরে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে... যে-ধর্ম একটা সুনির্দিষ্ট অবয়ব নিয়ে এদেশে এল তা হলো ইসলাম ধর্ম। বৈদিক আর্যধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ভারতবর্ষে এসেছিল অনেকটা সেইভাবেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও এখানে আসে সহজে খাদ্য সংগ্রহের লোভে ও স্বচ্ছন্দ জীবনধারার টানে এবং স্বাভাবিক জনবিস্তারের চাপে।

> তবে বৈদিক আর্যধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভারতবর্ষে বসবাসকারী বিভিন্ন অনার্যধর্মাবলম্বীদের প্রথম পরিচয় শুধু ধ্বংস ও সংঘাতের মাধ্যমেই হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্মের উদ্ভব হবার অনেক আগে থেকেই ইরানী আরব্য তুর্কী প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিম প্রাচ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষে মুসলিমদের সশস্ত্র অভিযানগুলো শুরু হওয়ার আগেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বণিকরা ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে, বিশেষত কেরলে, একটা নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলেছিল। যেমন মুসলিম সৈনিকদের অভিযান শুরুর আগেই মুসলিম বণিকদের আসা-যাওয়া শুরু হয় তেমনই উত্তর ভারতের মুসলিমদের প্রথম অনুপ্রবেশ নিরস্ত্র ও প্রেমিক সুফী সাধুসন্তদের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায়। ... স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে পরবর্তীকালে সৈনিকের বেশে আগত বিদেশী মুসলিমরা মোটামুটিভাবে বৈদিক আর্যদের পদাঙ্কই অনুসরণ করে। তবে অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য আর্যরা যতখানি সাফল্য দাবি করতে পারে মুসলিম যোদ্ধারা ততখানি সাফল্য দাবি করতে পারে না। তার কারণ বোধহয় এই যে বৈদিক আর্যরা যতখানি একাগ্রতা ও উগ্রতার সঙ্গে অনার্যদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছিল মুসলিমরা ততখানি একাগ্রতা ও উগ্রতার সঙ্গে আর্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়নি, তারা অনেকখানি পরসংস্কৃতি-সহিষ্ণু ছিল।
>
> (*ভারতবর্ষ ও ইসলাম* : পৃষ্ঠা ১৪-১৫)

এই পরমত পরসংস্কৃতি-সহিষ্ণুতা নিয়েই যত সমস্যা। সভ্য নাগরিক শিক্ষিত ভারতীয় যতই নিজেকে সেকুলার আখ্যা দিক না কেন অন্তরে সে সাম্প্রদায়িক। না হলে দেশের সহনাগরিককে বাস্তুচ্যুত করতে সে জনবিরোধী ক্যা, এনপিআর সমর্থন করে না। এদের কাছে আসামের ডিটেনশন ক্যাম্প আর করোনা বিশ্বমারীর কোয়ারেন্টাইন প্রায় সমার্থক। শাহীনবাগের প্রতিবাদ অকারণ বলে মনে হয়। দেশজুড়ে চলতে থাকা লকডাউনে এদের অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন ভুয়ো ভিডিয়ো বা তথ্য যা সাক্ষী দেয় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় কেউ লকডাউন মানছেন না। আসলে আমাদের মননে বেশ কিছু প্রাক্ নির্মাণ আছে। ছদ্ম সেকুলারাজিমের আড়ালে সেগুলো পদ্ম হয়ে ফুটে ওঠে। যাবতীয় অপরাধ, অশিক্ষা, অকারণ বিদ্বেষ-এর গ্লানি আমরা আমাদের সহনাগরিক মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর ঢেলে দিয়ে একটা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলি। মোহনদাস করমচাঁদ বা রবি ঠাকুর আমাদের চিন্তনে মুসলমানের দালাল। অতএব আমরা ভেবে নিই মুসলমান মানেই লুঠেরা, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসবাদী। অতএব গোরক্ষক বাহিনী অনায়াসে মবলিঞ্চিং করতেই পারে, স্বধর্মের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অমানবিক হতে পারে, মহিলাদের অবমানব বা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক ভাবতে পারে তাতে দোষ হয় না। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের এই প্রাক্ নির্মাণের স্থবির জায়গাটিকে একটু বদলানোর চেষ্টা করেছেন। ভারতের দীর্ঘ মুসলমান শাসনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, সংঘাত, সমন্বয়, গ্রহণ-বর্জনকে তুলে ধরেছেন অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে।

প্রসঙ্গত এসেছে আমাদের বঙ্গভূমির কথা। বাঙালির হিন্দুত্বও যেমন মনুবাদের সঙ্গে মেলে না, বাঙালি মুসলমানও তেমন ইসলামের কঠিন শৃঙ্খলের বাইরে। আসলে বাঙালি মানেই তো তার রক্তের ভিতর খেলা করে শিকল ভাঙার গান। শিকলে ধরা নাহি দিব। এই মাটিতে নিমাই পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠেন উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলকে আলিঙ্গন করেন, হরিনামের সুরে এই মাটিতেই গায়ে মাখেন পদরজ। কীর্তনের সুর যবনকে হরিদাস করে তোলে। ভক্তির ঢেউয়ে গোটা সমাজকে এভাবে তার আগে হয়তো কেউ একত্রিত করতে পারেনি। লালন সাঁই ও ঠিক তেমন। জাতপাতে ছিন্নভিন্ন এ-দেশের কাস্টপলিটিক্সের পুরোনো অভ্যাসের জায়গাটায় আঘাত এনেছিলেন। বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি মায়েরা আজও সন্তান অসুস্থ হলে পিরের দরগায় সিন্নি মানত করেন। আজানের সুর শাঁখের আওয়াজ একত্রে আজও ঘুরে বেড়ায় এ-বাংলার আকাশে। হিন্দু-মুসলিমের একত্র সহবাসের শিকড় কত গভীর যে হিন্দু নিম্নবর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিম পয়গম্বরকে হিন্দুদের রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর অবতার রূপে মেনে নিল। *ধর্ম পূজাবিধান* নামক গ্রন্থ থেকে জানতে পাই যে এসময় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে জনসাধারণ এতই উত্যক্ত হয়ে উঠল যে তারা শেষে ধর্মঠাকুরের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করল :

মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপ দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এ বড় হইল অবিচার।

উৎপীড়িতের প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুর আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারলেন না। ব্রাহ্মণদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে যবন বা মুসলমান রূপ ধরে নেমে এলেন পৃথিবীতে—

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খনকার।
ধর্ম হইলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম।
ব্রহ্মা হইল মোহাম্মদ বিষ্ণু হইল পেগম্বর
মহেশ হইল আদম। ...

পদ্যটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা নিষ্প্রয়োজন, তবে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের ফলে বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের জনসাধারণ খুবই ক্লিষ্ট ও নির্যাতিত জীবন যাপন

করছিল ও তারা নিষ্কৃতির জন্য ঐশী শক্তির কাছে প্রার্থনা করছিল এবং সে সময়ে বাংলার মুসলমান বিজয়াভিযান হলে তারা বেশ সমাদরের সঙ্গেই বৈকুণ্ঠ থেকে অবতীর্ণ পরিত্রাতারূপে মুসলমানদের বরণ করেছিল।

> একদিকে সঙ্ঘ শক্তির অভাব, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিপোষক রাজশক্তির প্রতি দেশীয় জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব এবং সর্বোপরি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা— এই তিনটি কারণ মুসলিম অভিযাত্রীদের জন্যে বাংলা বিজয়ের কাজকে বস্তুত অত্যন্ত সহজ করে তুলেছিল বলেই হয়তো এমন কাহিনী প্রচলিত হয় যে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে লখনৌতি বা লক্ষণাবতী অর্থাৎ গৌড় জয় করেন।
>
> (*ভারতবর্ষ ও ইসলাম*)

এই পথ দিয়ে বাংলায় ইসলাম ধর্ম ক্রমে মহীরুহের আকার ধারণ করে। সে কারণেই হয়তো চৈতন্যের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দুটি অভিমুখ স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথমত হিন্দুধর্মের সংস্কার, দ্বিতীয়ত শাসকশ্রেণির ছত্রছায়ায় লালিত ইসলাম ধর্মের গতিরোধ করা। তৃণাদপি সুনীচেন / তরোরিব সহিষ্ণুনা/ চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ/ হরিভক্তি পরায়নম— এই কথাটি সেই সময়ের ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসিত সমাজে সাধারণ মানুষের কানে মুক্তির সুর তুলেছিল। হরিনাম বা হরির প্রতি ভক্তি সকলকে এনে দেয় একাসনে। এক গৌরকান্তি সুপুরুষ হরিনাম সংকীর্তন করে আলিঙ্গন করেছেন অব্রাহ্মণকে, দলিতকে, অহিন্দুকে।

এরপর প্রসঙ্গক্রমে এসেছে রামমোহন-কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, বঙ্গভঙ্গ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও দেশভাগের উপক্রমণিকা। সর্বধর্মের আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে সুরজিৎ দাশগুপ্তের বক্তব্য তাৎপর্যময়।

> আপাতদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের উক্তিগুলিতে যুক্তির দৈন্যকে উপমার ঐশ্বর্যে আবৃত করা হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু তলিয়ে দেখলে মানতে হবে যে তিনি যুক্তি সম্পর্কিত অভ্যস্ত তথা লোকপ্রসিদ্ধ ধারণাকেই শুধু অস্বীকার করেছেন এবং সে ধারণার বাইরে বিচরণশীল ও সক্রিয় জীবনের গূঢ়তর বোধ-জাত এক লৌকিক ন্যায়ের অনুসারী তর্করীতিকে অবলম্বন করেছেন। এর ফলে তাঁর তর্ক পণ্ডিতের চাইতে মূর্খ বুঝতে পারে বেশি সহজে, আর তাঁর প্রস্তাবিত উপমা ও তুলনা সর্বদাই লৌকিক অভিজ্ঞতার থেকেই উত্থিত; এবং আরও স্পষ্ট করে বলা যায় তাঁর সত্ত্ব ও সত্য তথাকথিত ছোটলোক শ্রেণীর ধারণা ও ভাবনাতে সম্পূর্ণরূপে বিধৃত। সমাজের উচ্চতম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর জীবনধারা ও বাক্‌ভঙ্গী ছিল ভদ্রলোক শ্রেণীর আদর্শ বা ঈপ্সিত জীবনধারা ও বাক্‌ভঙ্গীর থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র, পক্ষান্তরে বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনধারা ও বাক্‌ভঙ্গীর শামিল এবং দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা একেবারে মৃত্তিকার স্তরে অবতরণের দুর্লভ সামর্থ্যেই তাঁর অবতারত্ব। অলৌকিক শক্তির

চমকপ্রদ প্রদর্শনে নয়, দেশীয় অধ্যাত্মসাধনায় প্রতীকী উত্তরণে রামকৃষ্ণ আধুনিক ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার অনন্য প্রতিভূ।

(*ভারতবর্ষ ও ইসলাম* : পৃষ্ঠা ১৪৪)

আধ্যাত্মিক আগ্রহের ফলেই অন্য ধর্মচর্চা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈজ্ঞানিকদের মতো পরীক্ষা করতেন। ১৮৬৬ সালে রামকৃষ্ণ ইসলাম ধর্মসাধনা করেছেন, এবং ওই সময়ের সাত বছর পরে বাইবেল পাঠ শুনে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে হয়ে ওঠেন খ্রিস্টান। উপলব্ধি করেন— খ্রিস্ট আর কৃষ্ণের অভিন্নতা। এবং সর্বধর্মের মূলকথা যে শেষপর্যন্ত এক এই একই উপলব্ধি দেখা যায় বিবেকানন্দের হিন্দুত্বের আদর্শে। 'বিবেকানন্দের অনুধাবিত হিন্দুধর্ম প্রকৃতই সমগ্র মনুষ্য সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় এক অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভাবাদর্শ।' (*ভারতবর্ষ ও ইসলাম*)। আসলে রামকৃষ্ণ অবতার কি না সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় রামকৃষ্ণের মধ্যে এমন এক ম্যাজিক ছিল যা বিবেকানন্দের মতো আধুনিক শিক্ষিত যুবাদের বাধ্য করেছিল শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে। এ প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অভিমত—

নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যদি কখনো কিছু আভিজাত্যপ্রীতি থেকে থাকে দরিদ্র, অর্ধনগ্ন (নগ্ন) অশিক্ষিত কালীপূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংস তা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন— তথাকথিত আচরণের শালীনতা, পরিমার্জনা বা ভাষার ভব্যরীতির সঙ্গে ধর্মের নিত্য সম্পর্ক নেই। যথার্থ ধর্ম মানুষকে পাগল করে দেয় আর পাগলের গায়ের কাপড়, মুখের ভাষার আগল থাকে না।

(*ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ* : অমলেশ ত্রিপাঠী)

এরপর সোজা রবি ঠাকুর। মনে হতে পারে মুসলমান নিয়ে আলোচনায় এত অমুসলমানের নামের উল্লেখ কেন? আসলে এ দেশ চিরকালই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। পরমত সহিষ্ণুতা যার ভিত্তি। আর এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরের ভদ্রাসন নির্মাণের আদিকার্মিক যারা তাদের কথা বারে বারে উচ্চারিত হবে। রবি ঠাকুর এমনই একজন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা, মুসলমানের পিছিয়ে থাকার কথা যিনি বার বার বলে গিয়েছেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে হেঁটে নাখোদা মসজিদে গিয়ে রাখী পরিয়ে এসেছিলেন বাংলা ভাগের চক্রান্তের দিনে। এ প্রসঙ্গে সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন—

বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীকালে তাঁর মতামত একই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগায় শুধু বিক্ষোভ, কেননা সম্ভবত তিনিই প্রথম হিন্দু যিনি দেশীয় সমাজের জনোপকরণের স্বরূপ অনুধাবন করে বিরোধমূলক হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের জন্যে হিন্দু সম্প্রদায়কেই অভিযুক্ত করেন ১৩১৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটিতে।

(*ভারতবর্ষ ও ইসলাম* : পৃষ্ঠা ১৬২)

এরপর গান্ধীকথা। মুসলিম লিগ জাতীয় কংগ্রেস দু-পক্ষই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে। নোয়াখালি মুঙ্গের ... জাতি দাঙ্গায় উজাড় হওয়া জনপদ।

আসন্ন মীরাট অধিবেশনের আগেই ১৯৪৬ সালের ২৮ অক্টোবর গান্ধীজী দিল্লী ছেড়ে নোয়াখালির পথে কলকাতা রওনা হন। শুরু হলো ৭৭ বছরের জীর্ণদেহী গান্ধীজীর বিখ্যাত নিঃসঙ্গ যাত্রা।

কলকাতা থেকে ৬ নভেম্বর রওনা হলেন নোয়াখালি। একদা যাঁরা ছিলেন অহিংস সত্যাগ্রহের সঙ্গী আজ তাঁরা সরকারী দায়িত্বের দৌলতে ক্ষমতাসীন। গান্ধীর সঙ্গী চারজন হলেন নির্মলকুমার বসু, মনু গান্ধী, পরশুরাম ও রামচন্দ্রন। চতুর্দিকে পরিকীর্ণ ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের ধ্বংসচিহ্ন, সংখ্যালঘুদের সর্ব অবয়বে পরিস্ফুট আতঙ্ক ও সন্ত্রাস এবং সৈন্য-ও-পুলিশ-বাহিনীর উপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পেশীতে পেশীতে অবরুদ্ধ আক্রোশ। গান্ধীজী সৈন্য ও পুলিশ সরিয়ে দিলেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলবেন বলে বাংলা শেখা শুরু করলেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অবিশ্রান্ত পদযাত্রা, বাঁশের সাঁকোর উপর বারবার ভারসাম্য রক্ষার পরীক্ষা, প্রতিদিনই প্রতিকূল জনতার ভর্ৎসনা আর প্রতিদিনই অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা। একটাই বিশ্বাস— 'যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।'

(*ভারতবর্ষ ও ইসলাম* : পৃষ্ঠা ২৬৩)

আজও একলা পথের পথিক মহাত্মা, কংগ্রেসের আদর্শচ্যুতি যাঁকে বার বার বিষণ্ণ করেছিল। হিন্দু মহাসভার নেতাদের দেশপ্রেমিক বলা বল্লভভাই প্যাটেলকে বলেছিলেন তুমি বদলে গেছ সর্দার। ক্ষমতাপ্রিয় কংগ্রেস নেতাদের কাছেও ক্রমে হয়ে উঠছিলেন ল্যায়াবিলিটি। অতঃপর তিনটি বুলেট। পরিশিষ্ট-সহ অষ্টাদশ পর্বে রয়েছে গান্ধী হত্যার পটভূমি ও গান্ধী হত্যার পর সাম্প্রদায়িকতা কেমন করে চেপে ধরবে ভারতীয় গণতন্ত্রের গলা তার একটা পূর্বাভাষ।

লোকটা রোজ রামধনু গাইত। রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখত। মনখারাপে রবি ঠাকুরের একলা চলো রে শুনে শান্তি পেত ... লোকটা দেশভাগ চায়নি। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার রক্ত দেখতে চায়নি। একা একা অশক্ত শরীরে হেঁটে বেড়িয়েছে নোয়াখালি থেকে বেলেঘাটা। লোকটা আজও একা হেঁটে বেড়ায় পুড়ে যাওয়া দিল্লির রাস্তায়, গোধরায়, অযোধ্যার রামজন্মভূমির আশেপাশে, আরও কত কত জায়গায় ... হে ভারত তুমি দেখছ তাকে? হঠাৎ লকডাউনে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন একবুক তেষ্টা একথালা খিদে নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরতে চেয়ে হাঁটে, ওদের ভিড়ে মিশে আদুল গায়ে হাতে লাঠি নিয়ে, অশক্ত শরীরে আজও হাঁটছে সে। হে ভারত ... দেখছ তো?